Girischandra Ghosh Lectures

# বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়



শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম্.এ.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৪

*Girischandra Ghosh Lectures*

# বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম্.এ.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৪৪

মূল্য—আট আনা

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY DINABANDHU GANGULEE, B.A.,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD. BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1521B—December, 1944—E.

# বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে দুটি বক্তৃতা লিখতে অনুরোধ করেছেন। আমিও তাতে স্বীকৃত হয়েছি।

বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে অসংখ্য সন্দেহ এবং তর্কের অবসর আছে। প্রথম কথা হচ্ছে, সাহিত্য আমরা কা'কে বলি?—প্রসিদ্ধ ইতালীয় দার্শনিক Benedetto Croce একটি পুস্তিকা লিখেছেন, তা'তে তিনি প্রথমেই এই প্রশ্নটি করেছেন—Che cosa e arte? অর্থাৎ Art বস্তুটি কি? এবং উত্তরে যা বলেছেন, তা' সকলেই জানে; কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধিকাংশ লোকেই ভুল করে। এর পর তিনি Art-এর আটদশ রকম ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন; ও অবলীলাক্রমে প্রত্যেকটি খণ্ডন করেছেন। এবং শেষে আর্ট বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন।

বলা বাহুল্য এটি একটি দার্শনিক প্রশ্ন। আমি সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরূপ প্রশ্ন তুলবও না, তার কোন উত্তরও দেব না। কারণ আমি ধরে নিচ্ছি যে, সাহিত্য কা'কে বলে, তা' আপনারা সকলেই জানেন। এ'তে আমার বক্তব্য সহজেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে।

এ বক্তৃতায় বাচালতা করবার বিশেষ সুযোগও নেই। কারণ বাঙ্গলা সাহিত্য বিপুল নয়। আমি পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস" সকলকে একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। তা'তেই দেখতে পাবেন যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের দেহ কতদূর কৃশ। ইংরাজী সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য, ইতালীয় সাহিত্যের তুলনায় বঙ্গসাহিত্যের বয়স অতি অল্প। পণ্ডিত-মশায় আমাদের সাহিত্যের আদ্যকাল, মধ্যকাল ও ইদানীন্তনকাল আলোচনা করেছেন। কৃত্তিবাস হচ্ছেন তাঁর মতে বাঙ্গলার একজন আদি লেখক। আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালের মুখ্য লেখক।

আমি বঙ্গসাহিত্যকে দুই যুগে বিভক্ত করি। এক নবাবী আমলের সাহিত্য; আর এক ইংরাজী আমলের সাহিত্য। নবাবী আমলের পিছনে যাবার জো নেই। কিছুকাল পূর্ব্বে দোহাকোষ ও চর্য্যাপদ নামক দু'খানি পুস্তিকা নেপালে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর একখানি—দোহাকোষ—বিশেষজ্ঞদের মতে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে দু'খানির ভাষাই বাঙ্গলা, তাহলেও এ পদাবলীকে কোনমতেই সাহিত্য বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, এগুলি যে কবে রচিত হয়েছিল, তাও ঠিক জানা নেই। সুতরাং আমি বর্ত্তমান বক্তৃতায় শুধু নবাবী ও ইংরাজী আমলের সাহিত্যেরই মোটামুটি পরিচয় দেব।

সাহিত্যমাত্রই কোন-না-কোন ভাষায় রচিত হয়। সুতরাং সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার অন্তরে ভাষার আলোচনা থাকে। নীরব কবি বলে' কোন কবির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। এখন এই বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল আছে। এবং পাঠকের সে কৌতূহল চরিতার্থ কর'তে পারেন philologistরা। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের বংশধর নয়। মাগধী প্রাকৃত কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হয়ে বাঙ্গলা ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান রূপ কি, তা' এখন বলা যাক্।

কতকগুলি শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলা যায় না। সে শব্দসমষ্টির পরস্পর যোগের নিয়মই ভাষার মূল কথা। ভাষা মাত্রেরই অন্তরে অন্য ভাষার নানা শব্দ আছে। আমাদের বাঙ্গলা ভাষাও নানা পরভাষার শব্দ অঙ্গীকার করেছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বল্‌বেন যে, বাঙ্গলা ভাষার অন্তরে বহু তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দ আছে। তৎসম হচেছ অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ,—যথা "বিবাহ"। তদ্ভব হচেছ সংস্কৃত হ'তে উৎপন্ন শব্দ,—যথা "বিয়ে"। আর দেশী শব্দ হচেছ "চুব্‌ড়ি কুলো ডালা" প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত আমাদের ভাষায় নানা বিদেশী শব্দ আছে, যথা পার্শী, আরবী, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজী, ইংরেজী ইত্যাদি; —অর্থাৎ আমাদের দেশ যাঁরা যাঁরা ভিন্ন সময়ে অংশতঃ অধিকার করেছেন, তাঁদের ভাষার শব্দ।

এই সব বিদেশী শব্দ বাঙ্গলায় এমনি মিশে গেছে যে, সেগুলি কোন্ ভাষা থেকে গৃহীত তা' অনেক সময় বোঝা যায় না। এর ফলে বাঙ্গলা ভাষার ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হয়েছে। এ সব শব্দকে স্বভাষা থেকে এখন বহিষ্কৃত করবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এবং আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে ইংরেজী শব্দ আরো বেশী পরিমাণে আমাদের ভাষায় ঢুকে যাবে। লেখায় আমরা কোন্ শব্দ কোথায় ব্যবহার করব, তা' লেখকের রুচির উপর নির্ভর করে।

আমাদের ভাষার মূলধন হচেছ তদ্ভব শব্দ; ভাষান্তরে আমরা যাকে বলি প্রাকৃত। আমার বন্ধু শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের, বঙ্কিমের, আমার এবং আরও দু'একজন লেখকের লেখা যদৃচ্ছা বিশ্লেষণ করে', শব্দ গণনা করে' আবিষ্কার করেছেন যে, আমরা মোটামুটি শতকরা ৩০ সংস্কৃত শব্দ, শতকরা ৬০ প্রাকৃত এবং বাকি শতকরা ১০ বিদেশী ও দেশী শব্দ ব্যবহার করি। তবে লেখক ও বিষয় অনুসারে অবশ্য তারতম্য হয়। বাঙ্গলা ভাষা আজও অত্যন্ত দরিদ্র। Webster's Dictionary-র সঙ্গে শ্রী রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' নামক অভিধান তুলনা করলেই সকলে দেখতে পাবেন, শব্দসম্ভারে আমাদের ভাষা কত দীন। বাঙ্গলা ভাষায় আর একটি ত্রুটি আছে। তা'তে abstract শব্দ একরকম নেই বল্লেই হয়; concrete শব্দই বেশী। বাঙ্গলায় আমরা বলি ছোটবড়, উঁচনীচ এ সব হচেছ

concrete শব্দ। কিন্তু পাঁচরকম বস্তুর এই সব প্রভেদ এক কথায় বোঝাতে হলে আমরা বলি 'অসম'; অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য হই। এর ফলে বাঙ্গলা ভাষা দর্শন লেখবার পক্ষে তত উপযোগী নয়, যত না সাহিত্যের পক্ষে। বাঙ্গলা লেখকেরা যত অধিক দর্শন চর্চ্চা করবেন, ততই তাঁদের প্রকাশভঙ্গি সংস্কৃত ভাষার কাছে আরো ঋণী হয়ে পড়বে। অবশ্য এর ভিতর একটু বিপদও আছে। সে হচ্ছে, অর্থ না বুঝে নির্ব্বিচারে সংস্কৃত দার্শনিক শব্দ প্রয়োগ করা। কারণ সংস্কৃত দার্শনিক ভাষা পরিভাষা মাত্র।

বাঙ্গলা ভাষা ধ্বনিগৌরবে সংস্কৃত এবং ইংরেজীর চাইতে হীন। ধ্বনি-গৌরব যে কবিতার একটা মস্ত অঙ্গ, তা' ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার কবিতা থেকে সহজেই দেখানো যায়। ইংরেজরা বলেন যে মিল্টন ইংলণ্ডের একজন বড় কবি। মিল্টনের Paradise Lost পড়লে আপনারা সকলেই এ কথার সত্যতা অনুভব করতে পারবেন। এবং সংস্কৃত কবিতার ধ্বনি যে কতদূর শ্রোত্ররসায়ন, তা বলাই বাহুল্য।

সংস্কৃত ভাষার এই গালভরা শব্দের প্রাচুর্য্যে সে ভাষা একটু গুরুভার হয়ে পড়েছে। সংস্কৃত ভাষায় অবশ্য চমৎকার epigram লেখা যায়। তার প্রমাণ ভর্ত্তৃহরির শতকত্রয়। অপর পক্ষে অসংখ্য তদ্ভব এবং দেশীবিদেশী শব্দের দৌলতে বাঙ্গলা ভাষা ফরাসীর মত একটি অতি চতুর ভাষা হয়েছে। ভারতচন্দ্র বলেছেন,—

"নাগর হে গিয়েছিনু নাগরীর হাটে
তারা কথায় মনের গাঁঠ কাটে।"

গুণীর হাতে এই বাঙ্গলা ভাষাও কথায় মনের গাঁঠ কাটে। এ ভাষা হাসে খেলে; অবশ্য সেই সব লেখকের হাতে যাঁরা হাসাতে খেলাতে পারেন। বাঙ্গলা ভাষা ওজনে ভারি নয়, কিন্তু অল্প কথায় নানারকম মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। এ যুগে সাহিত্যে রসিকতার যথেষ্ট আদর আছে। এবং আমাদের ভাষা এ গুণের চর্চ্চার অনুকূল। নবাবী আমলের অতি চতুর কবি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থই তার প্রমাণ। তিনি এক স্থানে বলেছেন,—

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

এ স্থলে মিছা মানে মিথ্যে কথা নয়। এখানে মিছা মানে অনাবশ্যক। আমাদের ভাষা এই বিস্তর লেখবার অনুকূল নয়। ইংরেজী ভাষার শতগুণ থাকা সত্ত্বেও, তার প্রধান দোষ হচ্ছে বিস্তর লেখা। এ দোষ ফরাসী ভাষার নেই। আমরা যদি ভবিষ্যতে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হই, তাহলে আশা করি বাঙ্গলা সাহিত্য পূর্ণমাত্রায় বেঁচে উঠবে।

আমরা সংস্কৃত ভাষার মোহ কখনো কাটিয়ে উঠতে পারব না। যে-সব বিদেশী শব্দ আমাদের ভাষার অন্তরঙ্গ হয়েছে, তাদেরও বর্জন করতে পারব না। যদিচ তদ্ভব কথাই বাঙ্গলার প্রাণ্। এ স্থলে আমি আর একটি কথার উল্লেখ করতে চাই। কিছুকাল থেকে আমাদের মধ্যে একটা তর্ক চলেছে যে, সাধুভাষা ও তথাকথিত চল্‌তি ভাষার ভিতর কোন্‌টি সাহিত্যের বাহন হবে। আমার মতে এ বিষয়ে কোন তর্ক নেই। যাঁরা বর্ত্তমান সাহিত্যের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে, তথাকথিত চল্‌তি ভাষা দিনের পর দিন সাহিত্যের নানা ক্ষেত্র দখল করে' নিচেছ্। এবং সাধুভাষা এখন সাহিত্যের নয়, সংবাদপত্রের আশ্রয়ে দিন গুজ্‌রান করছে।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের বয়স বেশি নয়। আর একটি কথা। বাঙ্গলা সাহিত্যের লেখকসংখ্যা অতি কম। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে, কৃত্তিবাস হচেছ্ন বাঙ্গলা সাহিত্যের আদি লেখক। এবং তিনি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক। কৃত্তিবাসের তারিখ নির্ণয় করবার মত উপাদান বেশি কিছু নেই। অতএব তাঁর অনুমান সম্ভবতঃ সত্য বলেই ধরে নেওয়া যাক্। যদিচ বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রভাব কৃত্তিবাসের রামায়ণে বিন্দুমাত্র নেই,—না ভাষায়, না মনোভাবে। বিদ্যাপতি বাঙ্গালী ন'ন, মৈথিলী কবি। এবং তিনি মৈথিলী ভাষাতেই কবিতা রচনা করেছেন। তাহলেও তাঁর ভাষা বাঙ্গলার এত কাছাকাছি যে, বাঙ্গালীরা তাঁর কবিতাকে প্রথম থেকে বাঙ্গলা বলেই ধরে' নিয়েছে। তাঁর রচিত কীর্ত্তিলতা নামক একখানি ছোট বই আছে, যার ভাষা পদাবলীর ভাষা নয়। বিদ্যাপতি একে অবহট্‌ঠ ভাষা বলেন ;—অর্থাৎ যাকে আমরা বাজারে হিন্দী বল্‌তে পারি। এ বই হচেছ্ জৌনপুরের বর্ণনা, যখন ইব্রাহিম সির্কী ছিলেন সেখানকার সুলতান। এর থেকে বিদ্যাপতির তারিখ ঠিক করা যায়। কবি বিদ্যাপতি দারভাঙ্গার রাজার তরফ থেকে জৌনপুরের সুলতানের কাছে দৌত্য করতে যান। এ ছাড়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ্ সারদাচরণ মিত্র খাঁটি মৈথিলী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদাবলীর যে সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তা'তে মনে হচেছ্ তিনি সে সময়কার জনৈক বাঙ্গলা নবাবের স্তুতিবাদ করেছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে সমসাময়িক, তা' প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাতের যে গল্প প্রচলিত আছে, তা' কিম্বদন্তি মাত্র। তবে এ কথা ঠিক যে, মহাপ্রভু চৈতন্য এই উভয়ের পদাবলীর গান শুনতে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

তারপরে আমরা পাই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য। এ ছাড়া অনেক মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল। তারপর কাশীরাম দাস বাঙ্গলায় মহাভারত রচনা করেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত

আজ পর্য্যন্ত অতিশয় জনপ্রিয়। কিন্তু এ দু'টির কোনটিই মূল রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ নয়। শুধু সেগুলি অবলম্বন করে বাঙ্গলা ভাষায় লেখা। কবিকঙ্কণ চণ্ডী বাঙ্গলা ভাষায় একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। কোন সংস্কৃত বই অবলম্বন করে এটি লেখা হয়নি। অন্ততঃ কোন কাব্য কিম্বা পুরাণের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ বইয়ে সেকালের একটি সমাজচিত্র পাওয়া যায়, যা' অপর কোন কাব্যে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কারণ তাদের নাম করেছেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যেরও উল্লেখ করেছেন। যদিচ তাঁর পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদের নাম করেননি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এই চণ্ডীকাব্যের আদর্শেই রচিত। এ কাব্য এক সময়ে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত অতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আমাদের সাধারণ শিক্ষিত সমাজে এ বই দু'খানি বরাবর উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। সম্প্রতি যাঁদের বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে, তাঁরা অবশ্য এ দুই গ্রন্থের আলোচনা করেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত মহাপ্রভুর জীবনের আংশিক ইতিহাস। এ ইতিহাস অতি চমৎকার। কারণ বইখানি যেমন সহজ তেমনি সরল,—যে দুটি হচ্ছে সাহিত্যের প্রধান গুণ। অপরপক্ষে চৈতন্য-চরিতামৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের একরকম ব্যাখ্যা। একে অনেকে বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্মের philosophy মনে করেন। ফলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের চৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষা সরলও নয়, সহজও নয়।

চৈতন্য-চরিতামৃত philosophical গ্রন্থ না হলেও, মধ্যে মধ্যে mystical philosophy-র চমৎকার ব্যাখ্যা আছে। কবিরাজ মহাশয় বলেছেন, তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে এ গ্রন্থ লিখেছেন, যখন তিনি ভাল করে চোখে দেখতে পান না, আর লিখতে তাঁর হাত কাঁপে। ধর্ম্মভাব যার মনে প্রবল নয়, তার পক্ষে এরূপ বিরাট গ্রন্থ এত বয়সে লেখা অসম্ভব। চৈতন্যের পরবর্ত্তী অনেক ভাল ভাল পদকর্ত্তা আছেন। তার মধ্যে কেউ কেউ ব্রজবুলি নামক কৃত্রিম ভাষায় পদ রচনা করেছেন; বিশেষতঃ গোবিন্দ দাস।

এ পর্য্যন্ত আমি বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয়ে কোন সাহিত্যের উল্লেখ করিনি। শূন্য পুরাণ নামে একখানি পুস্তক আছে; কিন্তু সেখানি কোন্ সময়ের লেখা বলা যায় না। কারণ তা'তে আছে যে, দেবতারা মুসলমান সেজে বাঙ্গলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং হিন্দুদের নানারকম শাস্তি দিয়েছিলেন। এ পুস্তকের প্রথম অংশ বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা। তারপর যে অংশে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের কথা আছে, সেটা পরের লেখা।

রাজা গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর উপাখ্যান পূরোপূরি বৌদ্ধধর্ম্মেরই পুস্তক। যে সম্প্রদায়ের ভিতর এই উপাখ্যান প্রচলিত ছিল, তাদের বলে নাথ সম্প্রদায়।

তাঁরা নাকি সকলেই যোগী ছিলেন। নাথ উপাধি আজও বাঙ্গলায় প্রচলিত। এবং তারা যুগী বলে পরিচিত। এ সম্প্রদায় বর্ত্তমানে উপবীত গ্রহণ করেছে। তাই বলে সমাজে উচচ শ্রেণীর লোক বলে গণ্য হয়নি। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদও সহজিয়া মতের পৃষ্ঠপোষক। এবং সহজিয়া মত যে বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে উদ্ভূত, তা' বোধ হয় সকলেই জানেন। এমন কি, বাঙ্গলায় যাকে সন্ধ্যাভাষা বলে, তা' আমার বন্ধু ডাঃ প্রবোধ বাগচী আবিষ্কার করেছেন একখানি চীনে গ্রন্থ থেকে। সে গ্রন্থখানি নাকি সন্ধ্যাভাষার অভিধান।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বহু পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাসের অনুকরণে পদ রচনা করেন। এবং বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত আরো অনেকে চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লেখেন। ফলে বাঙ্গলা ভাষা উন্নতি লাভ করে। তারপর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের লেখায় বাঙ্গলা ভাষা তার চরম রূপে প্রকাশিত হয়। এ ভাষা যেমন চতুর, তেমনি স্বচছ। ভারতচন্দ্র নবাবী আমলের শেষ লেখক হলেও, ইংরেজী আমলের অর্থাৎ বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রথম লেখক বলেও তাঁকে গণ্য করা যায়। তিনি বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং তাঁর ভাষা "যাবনী মিশাল"। সংস্কৃত ও বাঙ্গলাকে তিনি বেমালুম মিশিয়ে দিয়েছেন। কি কৌশলে যে তিনি এ কাজ করেছেন, তা' আমরা আজও জানিনে। তাঁর হাতে বাঙ্গলা ভাষা সাবালক হয়েছে।

এর পরে ইংরেজী আমলে আমাদের সাহিত্যের ভাষা প্রথমে ভেস্তে যায়। প্রথমতঃ Fort William College-এর পণ্ডিতের হাতে পড়ে' সংস্কৃতের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গলা একরকম আধা-বাঙ্গলা আধা-সংস্কৃত হয়ে পড়ে। তারপর ইংরেজী ভাষার আক্রমণে বাঙ্গলা তার নিজের রূপ হারিয়ে ফেলে। নবাবী আমলে সাহিত্য কেবলমাত্র পদ্যে লেখা হত। পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বলেছেন যে, চণ্ডীদাসের কবিতা গদ্য এবং পদ্যময়। কিন্তু তাঁর রচিত গদ্য পাওয়া যায় না। পদাবলী সাহিত্যকে lyric বলা যায়। কারণ সেগুলি সব গাওয়া হত। অপর কাব্যগুলি সব পাঁচালী। ভারতচন্দ্র তাঁর রচিত অন্নদামঙ্গলকে পাঁচালী বলেছেন। পাঁচালী বল্‌তে বোধ হয় পাঞ্চাল দেশের প্রচলিত কাব্য লেখবার পদ্ধতি বোঝায়। এও সুর করে' পড়তে হত। সংস্কৃত রামায়ণও কুশীলবরা গেয়ে বল্‌ত। আমাদের দেশে যত ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি আছে, সে সবই পাঁচালী। আমি ছেলেবেলায় মনসার কথা মুসলমান চাষীদের সুরসংযোগে আবৃত্তি করতে শুনেছি। এরা প্রায় সকলেই বৃদ্ধ। এবং শুনেছি যে তারা ভিন্ন আর কেউই মনসার কথা বল্‌তে পারে না। এর থেকে অনুমান করি যে, এককালে উক্ত কথা লৌকিক কথামাত্র ছিল, এবং সেই লৌকিক কথা অবলম্বন করে' পাড়াগেঁয়ে কবিরা তাদের সব মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। বেহুলা লখিন্দর এই উপায়েই রচিত হয়। আমি কৃষ্ণনগর থাকা

কালে কেওরাদের মধ্যে লখিন্দর আর বেহুলার যাত্রা শুনেছি। এ যাত্রার বিশেষত্ব ছিল এই যে, বেহুলা ও লখিন্দরের কথা গেয়ে বলা হচেছ, আর মধ্যে মধ্যে জন ৪।৫ লোক সমস্বরে ধুয়ো ধরছে "ও সে বাঁচবে না।" এতে গ্রীক নাটকের chorus-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এতদ্ব্যতীত মহাপ্রভুর যে-সব জীবনচরিত লেখা হয়েছে, সবই পদ্যে। নবাবী আমলের সাহিত্যের ভাষা যে এত সহজ, তার কারণ সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় তা' লেখা হত, ও সকলকে গেয়ে শোনানো হ'ত।

আমি এ যুগের একখানি মাত্র বই জানি, চৈতন্য-চরিতামৃত, পদ্যে লেখা হলেও যার ভাষা মোটেই সহজবোধ্য নয়। আমার কাছে যে বইখানি আছে, তার ভাষ্য সংস্কৃতে লেখা। এর থেকেই বুঝতে পারবেন জনগণের পাঠের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ লেখা হয়নি। বৃটিশ আমলের পূর্ব্বের কিছু কিছু গদ্যে লিখিত দলিলাদি পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, নবাবী আমলের লেখা হলেও, সে যুগের সাহিত্যে মুসলমানের বা মুসলমান ধর্ম্মের কোন প্রভাব সুস্পষ্ট নয়। যদিচ শুনতে পাই যে, মুসলমান নবাবরা এ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একমাত্র চৈতন্য-ভাগবতে দেখতে পাই গৌড়ের বাদশা হোসেন শা'র দরবারে মহাপ্রভুর যবন শিষ্য হরিদাসের বিচারকালে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রায় এক। এ উভয়ের ভিতর একই মত প্রকাশ করা হয়েছে। দুইই ভক্তির ধর্ম্ম, এবং একেশ্বরবাদী।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, কবিকঙ্কণ চণ্ডী কোন লৌকিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হয়েছে। তার প্রথম ভাগ কালকেতু নামক কোন ব্যাধের গল্প। আর দ্বিতীয় ভাগ ধনপতি সদাগর নামক কোন বণিকের সিংহলযাত্রার বিবরণ। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর দ্বিতীয়বার সিংহল যাত্রা করেন, এবং তাঁর বাপকে সিংহলের রাজার কারাগার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এই গল্প মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর ও বেহুলা লখিন্দরের গল্পের অনুরূপ। এ দুই উপাখ্যানই মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, পরে তা' লিখিত হয়েছে।

এর একখানিতে মনসা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে; অপরখানিতে চণ্ডীর। চণ্ডী দেবীর উপাখ্যান মনসা দেবীর উপাখ্যানের চাইতে কি ভাষায়, কি মনোভাবে, অনেক বেশি মার্জিত। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, চণ্ডীকাহিনী আমাদের সাহিত্যে মনসার কাহিনী অপেক্ষা আধুনিক। আর এমনও হ'তে পারে যে, যিনি চণ্ডীকাহিনী লিখেছেন, তিনি ছিলেন যথার্থ কবি। সে কারণে তাঁর লেখা অপর সকল মঙ্গলকাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উপরন্তু তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, বাঙ্গলা ভাষার বয়সও বেশি নয়, লেখকের সংখ্যাও

অতি কম। অবশ্য অতি অল্প সময়ের ভিতর অতি চমৎকার সাহিত্য গড়ে' তোলা যায়। যথা, গ্রীক সাহিত্য এক অ্যাথেন্স সহরে ১০০ বছরের মধ্যে লেখা হয়। অথচ আজও য়ুরোপীয়েরা তার দার্শনিক চিন্তাধারা অতিক্রম করতে পারেননি। আজও তাঁরা হয় Plato নয় Aristotle-এর মার্গাবলম্বী। এ ঘটনা একটা অলৌকিক ব্যাপার। গ্রীক দর্শন, গ্রীক কাব্য, গ্রীক ইতিহাস প্রভৃতি সব একসঙ্গে আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে, আর অল্প কালের মধ্যেই সে আগুন নিভে যায়। কিন্তু সে আগুনের আলো আজ পর্য্যন্ত সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যকে আলোকিত করে' রেখেছে। এরকম ব্যাপার অন্য কোন দেশে কোন কালে ঘটেনি। অপর পক্ষে নবাবী আমলের বঙ্গসাহিত্য অতি দরিদ্র। এমন কি, এক হিসেবে পাড়াগেঁয়ে বল্লেও চলে। একমাত্র এ যুগের বৈষ্ণব পদাবলী এবং ভাষাগুণে ভারতচন্দ্রের রচনাবলীকে বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বলে গণ্য করা যায়।

নবাবী আমলের সাহিত্য বলতে গান ও গল্প বোঝায়। পদাবলীও গান, পাঁচালীও গাওয়া হত। সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবাদ, যথা রামায়ণ ও মহাভারত, বাঙ্গালীর হাতে পড়ে' পাঁচালী হয়ে পড়েছে। নবাবী আমলে কোন নাটক ছিল না।

আমি এ পর্য্যন্ত নবাবী আমলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। এবং যতদূর সম্ভব, কোন অঞ্চলে বঙ্গসাহিত্য উদ্ভূত হয়েছে তাও বলেছি। তখনকার প্রায় সমস্ত লেখকই পশ্চিম বঙ্গের লোক। কৃত্তিবাসের বাড়ী শান্তিপুরের সন্নিকট ফুলিয়া গ্রামে; চণ্ডীদাসের বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে; কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মেদিনীপুরে বাঁকুড়া রায় নামক একটি ক্ষুদ্র রাজার আশ্রয়ে থেকে চণ্ডীকাব্য লেখেন। আর যাঁরা মনসামঙ্গল লেখেন, তাঁরাও সকলে পশ্চিম বঙ্গের লোক। মহাপ্রভু চৈতন্যের বাড়ী নবদ্বীপ। চৈতন্য-ভাগবতের লেখক বৃন্দাবন দাসের বাড়ীও সেইখানে। চৈতন্য-চরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ গ্রন্থ লেখেন বৃন্দাবনে বসে'।

চৈতন্যের পরবর্ত্তী যুগে তাঁর জীবনচরিত যাঁরা লিখেছেন এবং নানা পদাবলী রচনা করেছেন, তাঁরাও সব এই অঞ্চলবাসী। রামপ্রসাদ হালিসহরের লোক। ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান জেলার পেঁড়ো গ্রামে জন্মেছিলেন। তারপর নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে শেষটা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগর গিয়ে তাঁর অন্নদামঙ্গল লেখেন। এই অঞ্চলই নবাবী আমলের বঙ্গসাহিত্যের পীঠস্থান।

কি কারণে যে তা' হয়, সে বিষয়ে নানারকম অনুমান করতে পারা যায়; কিন্তু সম্ভবতঃ সে অনুমান প্রমাণ করা যায় না। সে আমলের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থেই বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। সম্ভবতঃ একটি বৌদ্ধ আখ্যান—ময়নামতীর গান—পূর্ব্ববঙ্গে রচিত হয়েছিল।

এর পরে আমি ইংরেজী আমলের বঙ্গসাহিত্যের পরিচয় দেব। তা'তে দেখতে পাবেন যে, আজও দুই একজন ছাড়া সব প্রধান লেখকই গঙ্গার উভয় কূলের লোক।

---

## ইংরেজী আমল

আমি কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরেজী ভাষায় একটি পুস্তিকা লিখি, এবং তার নাম দিই Story of Bengalee Literature। তা'তে আমি প্রথমেই লিখি ইংরেজরা বাঙ্গলা ভাষায় গদ্যসাহিত্যের আমদানি করেন। নবাবী আমলে বিষয়কর্ম্মের দলিলাদি গদ্যতেই লেখা হ'ত। আমি রানী ভবানীর দত্ত অনেক ব্রহ্মোত্তর জমির দানপত্র স্বচক্ষে দেখেছি; সে সবই গদ্যে লেখা। ভুষোকালীতে লেখা সে সব পত্রের অক্ষর খুব বড় বড়, ও বোধহয় খাগ্‌ড়ার কলমে লেখা। আর কালী এতই চমৎকার যে, আজ পর্য্যন্ত তা' ফিকে হয়নি। জমিদারী সেরেস্তা ঘাঁটলে বোধ হয় এ-জাতীয় দলিলপত্র আজও অনেক পাওয়া যায়। অবশ্য এ-সব লেখাকে কোন হিসেবেই সাহিত্য বলা যায় না। Carey, Marshman প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনরিরা মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং শ্রীরামপুরের কোন কর্ম্মকারকে ছাপার অক্ষরের ছাঁচ তৈরি করতে শেখান। তার পরেই বাঙ্গলা ভাষায় নানারূপ গদ্য পুস্তক প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ হয়। Fort William-এর অধ্যাপকরা 'যুবক সাহেবজাতগণ'কে কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যলেখক কে, তা বলা কঠিন। রামরাম বসু যে ন'ন, তার প্রমাণ রাজা রামমোহন রায় তাঁর লেখা মেজেঘষে দিয়েছিলেন, এই হচ্ছে অনেকের মত। রামমোহন রায় তাঁর বাঙ্গলা গ্রন্থাবলীর প্রথমেই লিখেছেন যে, বাঙ্গালীরা আজ পর্য্যন্ত গদ্য লিখতে শেখেনি। এমন কি, তাদের অনূদিত প্রত্যক্ষ কানুনেরও অর্থ উদ্ধার করা যায় না। সে সবই হ য ব র ল। এই সব হ য ব র ল-কে কি করে' বাঙ্গলা গদ্যে পরিণত করা যায়, তাও রামমোহন রায় দেখিয়ে দিয়েছেন।

Fort William কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বাঙ্গলা রচনা আমার খুব ভাল লাগে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সজনী দাস ও ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন। আমি সে গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ও 'রাজাবলী' সকলকেই পড়তে অনুরোধ করি। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র

আরম্ভের ভাষা অতি উৎকট। কিন্তু তাহলেও লেখক ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে অল্পের মধ্যে যে আলোচনা করেছেন, তা' খুব ভাল। অলঙ্কার শাস্ত্র তিনি দণ্ডীর কাব্যাদর্শ থেকে প্রায় কথায় কথায় অনুবাদ করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক রসিকতাজ্ঞান এ লেখাতেও প্রকাশ পায়। কাব্যাদর্শ অবশ্য প্রাচীন অলঙ্কারের আদি এবং প্রবীণ পুস্তক। তিনি নব্য অলঙ্কারেরও আলোচনা করেছেন, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা প্রভৃতি বিশেষ গুণ গ্রাহ্য করেননি। ন্যায়দর্শন তিনি কতকগুলি ছোট গল্প দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র প্রথম ভাগ বহুল পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার অধীন। কিন্তু তার দ্বিতীয় ভাগে পণ্ডিত মহাশয় কতকগুলি গল্প বলেছেন, এবং সেই সূত্রে স্থানে স্থানে চমকপ্রদ চল্‌তি ভাষা ব্যবহার করেছেন, তখনকার মৌখিক ভাষার নমুনা হিসেবে। আমি রাজসাহীর সাহিত্য সম্মিলনে যে অভিভাষণ পাঠ করি, তা'তে তাঁর লিখিত একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি। সে বর্ণনা পড়ে' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে যান। তিনি আমাকে বলেন যে,—আগে কি ভাষাই ছিল, আর আমরা তাকে কি ভাষায় পরিণত করেছি।

'রাজাবলী' হচ্ছে ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাসের গ্রন্থ। সে গ্রন্থে হিন্দু যুগের ইতিহাস নগণ্য। তারপর মুসলমান যুগের বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা' মোটামুটি সত্য। আর সিরাজদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা মেরে কি করে' রাজা হয়ে বসলেন, তার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন। সে নাটকের প্রধান পাত্রদের চরিত্র এবং ব্যবহার সম্বন্ধেও তিনি নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলেছেন। তিনি উক্ত পুস্তকে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের বিষয় যা' লিখেছেন, তা' মূলতঃ সত্য। আমি উক্ত বর্ণনা অবলম্বন করে' পানিপথের যুদ্ধের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। কাশীনাথ রাও বলে' একটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এবং তিনি স্বচক্ষে যা' দেখেছেন, তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ফারসী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই ফারসী পুস্তিকা-খানি ব্রাউন নামক কোন ইংরেজ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। এবং সেই পুস্তিকাই এ বিষয়ে পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের আজ পর্য্যন্ত একমাত্র অবলম্বন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এ ঐতিহাসিক তথ্য যে কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, তা' আমার কাছে একটা রহস্য রয়ে গেছে। কারণ তিনি ইংরেজীও জানতেন না, ফারসীও জানতেন না। সে যাই হোক্, 'রাজাবলী' বইখানি পাঠ্য। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' একখানি text book মাত্র। 'রাজাবলী' হচ্ছে তার কাটছাঁট বাদ দিয়ে বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এ বইখানির ভাষায় অসংখ্য ফারসী শব্দ আছে, যে-সকল শব্দ লোকের মুখে তখন প্রচলিত ছিল।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, ইংরেজী আমলের আগে বাঙ্গলায় গদ্যসাহিত্য ছিল না। তাই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কি করে' এমন গদ্য লিখলেন, তা' বোঝা শক্ত। 'রাজাবলী'ই প্রমাণ যে, গান এবং পাঁচালী ছাড়া ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালীরা পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে গদ্য লিখতে শেখাননি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে রামমোহন রায়ের পরিচয় ছিল, এবং তিনি পণ্ডিত মহাশয় ও তাঁর পাণ্ডিত্যের বিষয় নিজ গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন। উপনিষদ্‌গুলি যে তাঁর স্বরচিত নয়, তা' প্রমাণ করবার জন্য তিনি বলেছেন যে, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেই সব উপনিষদ্ দেখতে পাবেন, সেগুলি আমি বানাইনি।

বাঙ্গলার অদ্বিতীয় মহাপুরুষ রামমোহন রায়, যিনি নানাদিক দিয়ে বর্ত্তমান বাঙ্গলা গড়ে' তুলেছেন, তিনি বাঙ্গলা গদ্য গড়বার উপায়ও বলে' দিয়েছেন। তাঁর ইংরেজী ও বাঙ্গলায় নানা জীবনচরিত আছে। কিন্তু তার কোনটিই সন্তোষজনক নয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে সম্প্রতি যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, সেইটিকেই আমি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে করি। লেখক অসাধারণ পরিশ্রম করে' রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন, যা পূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল না। তিনি সন্দেহ করেন যে, রামমোহন রায় বাঙ্গলার আদি গদ্যলেখক ন'ন। কিন্তু তাঁর পুস্তকে তিনি রামমোহন রায়ের গদ্যলেখার সে-সব নমুনা তুলে দিয়েছেন, সেইগুলি পড়লেই তিনি যে গদ্য লেখবার হদিশ বাৎলেছেন, তা' সকলেই দেখ্‌তে পাবেন। উপরন্তু, তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামক একখানি ছোট ব্যাকরণ লেখেন। আমার বিশ্বাস যে, সেইখানি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ। তা'তে তিনি ব্যাকরণ কা'কে বলে, সে কথা অতি সহজ ভাষায় বিশদভাবে পাঠকদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাকরণখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হওয়া অতি বাঞ্ছনীয়। রামমোহন রায় যদি কোন ভুলভ্রান্তি করে' থাকেন, তাহলে এই নতুন সংস্করণে পাদটীকায় সে কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধু নতুন সম্পাদক যেন মনে রাখেন যে, এটি সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়,—গৌড়ীয় ব্যাকরণ। তাই এতে সন্ধিসমাসের বর্ণনা নেই; গ্রন্থকার দু'কথায় এদু'টি বিষয় সেরেছেন। রামমোহন রায়ের ভাষা অবশ্য সংস্কৃতবহুল। তার কারণ, তিনি ধর্ম্ম, দর্শন ইত্যাদি যে-সব গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা'তে সংস্কৃত শব্দ বাদ দেওয়া যায় না। তাঁর ভাষার আর একটি দোষ এই যে, তিনি তাঁর লেখা punctuate করেননি। আমি পূর্ব্বে তাঁর একটি লেখা নিজে punctuate করে' প্রকাশ করি; তা'তে সে লেখা জলবত্তরল হয়েছে।

রামমোহন গুটিকতক গানও রচনা করেন। কিন্তু তিনি কবি ছিলেন না বলে' সেগুলি আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত নেই; এককালে ছিল। তাঁর লেখায়

হাস্যপরিহাস দেদার আছে; কিন্তু কোন জায়গায় অভদ্রতা নেই। তাঁর বিরোধী পক্ষকে তিনি হাস্যাস্পদ করবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু কখনো কোন ইতর মনোভাব প্রকাশ করেননি। যে কালে রামমোহন রায় এদেশে আবির্ভূত হন, সে কালে তাঁকে পাঁচ ভাষায় গ্রন্থ লিখতে হয়েছে; ফারসী, কিঞ্চিৎ আরবী, সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গলা। ইংরেজরা এদেশে কি কি নতুন মনোভাব আমদানি করেন, এবং কি পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র গড়ে' তোলেন, তা' তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। এবং সে-সব বিষয়ে তিনি তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কোনটি গ্রাহ্য করেছেন, কোনটি করেননি। দুঃখের বিষয়, পলিটিক্স ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অতি চমৎকার লেখাগুলি তিনি ইংরেজীতেই লিখেছেন।

এরপর Fort Willam কলেজের অধ্যাপক ব্যতীত অপরের দ্বারা যে-সব পুস্তক লেখা হয়, তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই। কিন্তু দু'খানি বই,—প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প'্যাচার নক্সা,'—প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ দু'খানি আজও পাঠ্য। প্রথমখানি সম্প্রতি বোধহয় পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্ব্বাচিত হয়েছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' নভেল হিসেবে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তা'তে ইস্কুল, আদালত প্রভৃতি বিষয়ের যে-সব বর্ণনা আছে, তার থেকে সেকালের একটি সঠিক সমাজচিত্র পাওয়া যায়। এ বইখানির ভাষা আমরা একালে যা'কে চল্‌তি ভাষা বলি, ঠিক তা' নয়। বরং মূলতঃ সাধুভাষা বল্লেও চলে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে লেখক টেকচাঁদ ঠাকুর এমন খাঁটি বাঙ্গলা লিখেছেন, যা' পড়ে' অবাক হ'তে হয়। বাঙ্গলা ভাষার প্রাণ যে কোথায়, তা' আবিষ্কার করা যায়। এ গদ্য ইংরেজী গদ্যের অনুকরণে লেখা হয়নি। তার পর কালীপ্রসন্ন সিংহ অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। আজ পর্য্যন্ত এই অনুবাদই মহাভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ। শুনতে পাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির হাতও এ অনুবাদে আছে। এরপর কালী সিংহ তাঁর 'হুতোম প'্যাচার নক্সা' প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থখানি হচেছ তখনকার সমাজের আগাগোড়া বিদ্রূপ এবং অতি চমৎকার লেখা। এ বই সেকালের কলিকাতা সহরের চল্‌তি ভাষায় লেখা। এরকম চতুর গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি সুন্দর সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। যাঁরা এ পুস্তক পড়েননি, তাঁদের তা' পড়তে অনুরোধ করি।

ইতিমধ্যে বাঙ্গলায় অনেকগুলি সংবাদপত্র বেরোয়। এবং তার থেকে দেখা যায় যে, আজকাল যে-সব বিষয় নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচিছ,—যথা স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা,—সে-সব বিষয় সে-কালের সংবাদপত্রেও আলোচিত হয়েছে। এই কারণে এ যুগকে আমি ইতিপূর্ব্বে প্রধানতঃ সংবাদপত্রের যুগ বলেছি; —দৈনিক নয়, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সংবাদপত্র। এই সব সংবাদপত্রলেখকদের

মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন প্রধান। তিনি অনেক কবিতাও লিখেছেন। এমন কি, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছেন। এরপর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' নামক একখানি কবিতার বই লেখেন। আমরা ছেলেবেলায় উক্ত পুস্তিকার কোন কোন অংশ মুখস্থ করতে এবং আবৃত্তি করতে বাধ্য হতুম। আমার এখনো তার দু'চার ছত্র মুখস্থ আছে। যথা :—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে,
কে বাঁচিতে চায়।"

আর "স্বাদলের বারিধারা প্রায়
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।"

ইতিমধ্যে Fort William কলেজ বোধহয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং হিন্দু কলেজ নামক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। Fort William কলেজের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বাঙ্গলা, ফারসী প্রভৃতি এ দেশের ভাষা শেখানো। হিন্দু কলেজের উদ্দেশ্য হল প্রধানতঃ বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানদের ইংরেজী ভাষা, ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস এবং কিঞ্চিৎ দর্শন শিক্ষা দেওয়া। হিন্দু কলেজে সংস্কৃত শেখানো হত না। ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরিচয় ছিল না। এ কলেজের অনেক ছাত্র পলিটিক্‌স্ নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। এবং কেবলমাত্র ইংরজী ভাষা শিক্ষার প্রসাদে তাঁরা আমাদের সমাজকে ওলোট-পালোট করবার চেষ্টায় ছিলেন। একমাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে বাঙ্গলা কাব্য লেখেন। মিল্টন প্রভৃতির নজিরে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁর কবিতা লেখেন। তাঁর রচিত 'মেঘনাদ বধ কাব্য'কে আজও অনেক লোকে মহাকাব্য বলে' মনে করেন। কিন্তু আমি তাঁর কৃত্রিম ভাষায় রচিত কাব্যগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত বলে' মনে করি।

রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' বইখানি পড়ে' দেখবেন, তা'তে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাবেন।

আমি রঙ্গলালের বিষয় উল্লেখ করেছি। তিনি অবশ্য মাইকেলের পরবর্ত্তী সাহিত্যিক। কিন্তু কি ভাষায়, কি ছন্দে, কি মনোভাবে, মাইকেলের কোন প্রভাব তাঁর লেখায় বিন্দুমাত্র নেই। সত্য কথা বলতে, মাইকেলী ধাঁচায় তাঁর পরবর্ত্তী কোন কবি লেখেননি। অবশ্য তাঁর লেখার দু'টি একটি প্যারডি আছে, যথা : 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য' ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-উদ্ধার কাব্য'। শেষোক্তটি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এটিকে আমি মনে করি বঙ্গসাহিত্যের একটি রত্ন। মাইকেলকে ব্যঙ্গ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তিনি মাইকেলী ভাষাকে হাস্যাস্পদ করেছেন। সে ভাষার কি কি দোষ, বহুকাল পূর্ব্বে রামগতি

ন্যায়রত্ন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে' বলে' গিয়েছেন ; আর তাঁর সমালোচনা আমাদের কাছে আজও সম্পূর্ণ সত্য বলে' মনে হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি.এ. বঙ্কিমচন্দ্র। এ বিদ্যালয়ে বোধহয় সংস্কৃত পড়ানো হ'ত। উপরন্তু সিপাহী বিদ্রোহ ছাত্রদের মনে নতুন মনোভাব আনলে। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক। তিনি শুধু নভেলই লেখেননি, নানা বিষয় আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরেজীর প্রভাব থেকে মুক্ত ন'ন। এমন কি, তাঁর প্রথম নভেল 'দুর্গেশনন্দিনী' কে লোকে মনে করত Walter Scott-এর Ivanhoe অবলম্বনে লিখিত। সে যাই হোক, তিনি বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। আজ পর্য্যন্ত তাঁর মত গল্প-বলিয়ে আর কেউ হননি। তাঁর সময় Mill-এর প্রভাব খুব বেশি ছিল। তিনি মিলের শিষ্য ছিলেন। জন ষ্টুয়ার্ট্ মিল-এর জনৈক ভক্ত Seeleyর প্রভাবও তাঁর ধর্ম্ম এবং দর্শন ইত্যাদি বিষয় লেখায় ধরা পড়ে। এ স্থলে আমি আর একটি কথা বলতে চাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক। এবং লোকের বিশ্বাস যে, বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের ভাষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও নতুন এক ভাষার সৃষ্টি করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যা' লিখে গেছেন, তা' সবই বোধহয় ইস্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার বিষয় হচেছ প্রধানতঃ উপন্যাস। সুতরাং এ দুই লেখকের ভাষার তুলনা করা অসম্ভব। বিদ্যাসাগরী ভাষা অতি সহজ গদ্য। বাঙ্গলা ভাষাও যে syntax-এর গুণে অতি চমৎকার ভাষা হতে পারে, তা' প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখে দেখিয়ে দেন। তাঁর 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তক যথেষ্ট সংস্কৃতবহুল। কিন্তু 'বিধবা বিবাহ' ও 'বহু বিবাহ' পড়ে' দেখবেন যে, তাঁর বাঙ্গলা ভাষার শক্তি এবং গতি কি চমকপ্রদ। যদিচ সে ভাষা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ভাষা নয় এবং কলকাতার চল্‌তি ভাষাও নয়। তাঁর এ দুই গ্রন্থের ভাষা যেমন সচল তেমনি সাবলীল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সেকালে একটু নতুনত্ব ছিল। কিন্তু কি গুণে যে তা' নতুন, তা' বলা কঠিন। আমার বিশ্বাস তাঁর বলবার ভঙ্গিটিই নতুন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বহুপূর্ব্বে বলেছেন যে, 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষার চাইতে এ ভাষা উন্নত ও মধুর, এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ভাষার সগোত্র। তা' অবশ্য নয়। তার পরে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করেছেন ; কিন্তু বিষয়বস্তুতে, ভাষায় নয়। তিনিও লিখেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস।

তারপরে কোন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমী-ভাষায় লিখেছেন বলে' আমি জানিনে। এমন কি, তাঁর ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন,

অথচ সুন্দর। একালের নভেল-লিখিয়েরা কেউ তাঁর ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলায় একটি standard prose গড়ে' যাননি। তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় লেখক। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। অতএব একটা যুগকে আমরা যে বঙ্কিমী যুগ বলি, তা' যথার্থই বলি।

আমি পূর্ব্বে মাইকেলকে মহাকবি বলে' স্বীকার করিনি। কিন্তু তিনি যে কবি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্য' পড়ে' দেখবেন; কোন অকবি এ কাব্য রচনা করতে পারতেন না। আজ পর্য্যন্ত অপর কেউ ও-জাতীয় কাব্য লিখতে চেষ্টাও করেননি, পারেনওনি।

তারপর অনেকদিন ধরে যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁরা এক বর্ণনা লিখলেও বঙ্গসাহিত্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমি যাদের লেখার কিছু-না-কিছু প্রশংসা না করতে পারি, তাদের কাব্যের বিষয় নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করি। মাইকেলের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে অপর কেউই কবিযশ পাবার উপযুক্ত হননি। একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া। যাঁরা তাঁর 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' পড়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন। তাঁর ভাষা ও ছন্দ চমৎকার। এবং ও-কাব্যে ইংরেজী সাহিত্যের কোন প্রভাব নেই। এতদ্ব্যতীত তিনি মজা করে' যে-কটি কবিতা লিখেছেন, তার humour আমাদের যেমন আনন্দ দেয় তেমনি অবাক করে। বাঙ্গলা ভাষার উপর তাঁর এমন অধিকার ছিল যে, তিনি সে ভাষা নিয়ে অবলীলাক্রমে খেলা করতে পারতেন। বঙ্কিমীযুগকে ছাড়িয়ে আমরা একেবারে রবীন্দ্রযুগে এসে পড়ি, যে যুগ রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত।

বঙ্কিমের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা যে গদ্যসাহিত্য রচনা বন্ধ করেছিলেন, তা অবশ্য নয়। অনেকে ইংরেজী সাহিত্য থেকে পুস্তক অনুবাদ করবার ভার নিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, আমি নিম্নলিখিত অনূদিত গ্রন্থাবলী দেখেছি এবং কতক কতক পড়েছি: সমগ্র একাধিক সহস্র রজনী, টমকাকার কুটীর, রবিন্সন ক্রুসো, রাসেলাস, পারস্য উপন্যাস, Wandering Jew প্রভৃতি। এই অনুবাদকদের যথেষ্ট দম ছিল। কেউ কেউ আবার মূল গ্রন্থ লিখতেও চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে রজনী গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' এককালে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' সম্পূর্ণ অভিনব এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি প্রতি লেখক ও কবির বাস কোথায় ছিল, তা' খুঁজে বের করেছেন। তিনি বঙ্কিম ও মাইকেলের প্রশংসা করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁদের ভাষার প্রতি টিট্‌কারিও দিয়েছেন। এক হিসেবে এ বইখানি critical। কবিকঙ্কণের তারিখ সম্বন্ধে বিচারটি পড়ে' দেখবেন।

এ-জাতীয় গ্রন্থসকল বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রবাহকে মন্দীভূত হতে দেয়নি।

বাঙ্গালীর লেখা কোন দর্শন কি বিজ্ঞানের পুস্তক দেখিনি। অবশ্য দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, যথা : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেউ কেউ দুটি একটি ভাল গ্রন্থ লিখেছেন, যথা : হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'গীতার ঈশ্বরবাদ' এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম'।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী অনেক ছোটখাটো গান রচনা করেছেন। এবং কতকগুলি গান খুব লোকপ্রিয়ও হয়েছিল, যথা : গোবিন্দ রায়ের "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও," এবং "কত কাল পরে বল ভারত রে দুখসাগর সাঁতরি' পার হবে"; এবং মনোমোহন বোসের "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন"। এ তিনটির কোনটিই প্রেমের কবিতা নয়, অথচ বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করেছিল। কোন কোন ব্রহ্মসঙ্গীতও সেকালে খুব প্রচলিত হয়েছিল। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতসঙ্গীত'-এর উল্লেখ করলুম না ; কারণ এমন বাঙ্গালী বোধ হয় নেই, যিনি সেটির সঙ্গে সুপরিচিত ন'ন।

আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, নবাবী আমলে কোন নাটক লেখা হয়নি। বৃটিশ যুগে সর্ব্বপ্রথম আমরা নাটকের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু সেগুলি ইংরেজী নাটকের অনুবাদও নয়, অনুবৃত্তিও নয়। কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের বাঙ্গলা অনুবাদ। অপরগুলির বিষয়বস্তু, হয় কোন পৌরাণিক উপাখ্যান না-হয়ত সমসাময়িক সমাজচিত্র। আমি যতদূর জানি, রামনারায়ণ তর্করত্ন নামক কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত সর্ব্বপ্রথম 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নামে একখানি নাটক লেখেন। ও-নাটকের নামেই পরিচয় যে, এখানি কৌলিন্য প্রথার উপর আক্রমণ। এরপর শুনতে পাই যে, তিনি 'নবনাটক' নামে আর একখানি নাটক লেখেন। তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'পদ্মাবতী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' নামে দুখা'নি নাটক রচনা করেন ; ও পরে দু'খানি প্রহসন লেখেন —'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। এ সবগুলিই, কি নাটক কি প্রহসন হিসেবে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নামে একখানি নাটক, ও 'সধবার একাদশী' নামে একখানি প্রহসন লেখেন। তিনি আরও খানকতক নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু সেগুলি নগণ্য। 'নীলদর্পণ' সেকালের নীলকরদের অত্যাচারের একটি বর্ণনা। এদানি কেউ আর সেটি অভিনয় করেন না। 'সধবার একাদশী' কিন্তু আজও একটি জনপ্রিয় নাটিকা।

তারপরে বোধহয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সরোজিনী,' 'অশ্রুমতী' ও 'পুরুবিক্রম' নামক তিনটি নাটক রচনা করেন। 'সরোজিনী' এককালে খুব লোকপ্রিয় ছিল। তিনি দু'খানি প্রহসনও লেখেন—'কিঞ্চিৎ

জলযোগ' এবং 'এমন কর্ম্ম আর করব না'। শেষোক্তটি যথার্থ প্রহসন, এবং এখনও 'অলীকবাবু' নামে অভিনীত হয়। বহুপরে তিনি বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটকগুলি বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন।

এরপর অবশ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি অনেকে থিয়েটারের জন্য নাটক লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান একটি সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণীর চমকপ্রদ জিনিষ, যা' বোধহয় বহুলোকের কাছে সুপরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার বেশি কিছু বলবার নেই। তাঁর বিরাট প্রতিভা সাহিত্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোট-গল্পলেখক ও প্রবন্ধলেখক। তাঁর প্রবন্ধে ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি কোন বিষয়ই উপেক্ষিত হয়নি; এবং এ সব লেখাই লোকের মনকে জাগ্রত করেছে, উন্নত করেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বজাতির হাতে এক হিসেবে দূরবীণ দিয়েছেন, যার সাহায্যে বাইরের জগৎ দেখা যায়; আর সেই সঙ্গে অনুবীণ দিয়েছেন, যার সাহায্যে মনোজগৎ দেখা যায়। আর তাঁর কথা সকলেই শুনতে পেয়েছে, কারণ তিনি খাদে গলা সাধেননি। আমরা এখন তাঁরই মানসিক আবহাওয়াতে বাস করছি। সুতরাং আমাদের পক্ষে তাঁর সাহিত্যের বিচার করা সম্ভব নয়। আমরা এখন কেবল তাঁরই কথায় বলতে পারি:

"তুমি কেমন করে' গান কর যে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।"

---



